সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তি: স্বরূপ ও ব্যাপকতা*

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৩১ মে, ২০০৯)

A land of settled government,
A land of just and old renown,
Where Freedom slowly broadens down,
From precedent to precedent.
- Alfred Tennyson

আমাদের সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদে সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির (parliamentary privileges and immunities) বিধান রয়েছে। সাংবিধানিক বিধানানুযায়ী সংসদ আইনের দ্বারা এগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার কথা। কিন্তু এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনো আইন প্রণীত হয় নি। এদিকে বিষয়টি সম্প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত দুদকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের ও সাবেক স্পীকার জনাব জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে সংসদের বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করার অভিযোগ উত্থাপনের প্রেক্ষিতে। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো বিষয়টির ওপর আলোচনার সূত্রপাত করা, যাতে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো সুস্পষ্ট হতে পারে।

১.০ বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তি: কী এবং কেন?

সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার এবং দায়মুক্তির ধারণার উৎপত্তি যুক্তরাজ্যে। শোনা যায়, এককালে ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের গ্যালারীতে গোয়েন্দারা বসে থাকতো এবং কারা রাজার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতো। সমালোচনাকারীরা অনেকসময় হুমকি, এমনকি মারধোরের শিকার হতেন। সার্বভৌম সংসদ রাজকীয় হুমকির মুখেও স্বাধীন ও কার্যকরভাবে যেন কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই সংসদীয় বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির ধারণার উৎপত্তি। আমাদের জানামতে এর প্রথম প্রয়োগ হয় ১৫৫৪ সালে।

সংসদীয় বিশেষ অধিকার এবং দায়মুক্তির পুরানো ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন এরেসকাইন মে (Erskine May, *Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament*, 23rd ed.): æParliamentary privilege is the sum of the peculiar rights enjoyed by each House collectively ... and by member of each House individually, without which they could not discharge their functions, and which exceeded those possessed by other bodies or individuals. Thus privilege, though part of the law of the land, is to a certain extent an exemption from the general law." ('সংসদের বিশেষ অধিকার হলো কতগুলো স্বতন্ত্র অধিকারের সমষ্টি যা প্রত্যেক সংসদ সদস্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সংসদের উভয় কক্ষই উপভোগ করে। এগুলো অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভোগ করা অধিকারের চেয়ে অতিরিক্ত অধিকার এবং এগুলো ছাড়া সংসদ ও সংসদ সদস্যগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে অক্ষম। তাই যদিও বিশেষ অধিকার রাষ্ট্রীয় আইনের অংশ, তবুও এগুলোর মাধ্যমে অনেকটা সাধারণ আইনের আওতা থেকে তাঁদেরকে রেহাই প্রদান করা হয়।') আমাদের দেশে অবশ্য উচ্চকক্ষ নেই, তাই উচ্চ কক্ষের কথা আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

এ সকল স্বতন্ত্র অধিকারগুলোকে দু'ভাবে বিভাজন করা যায় – যেগুলো এককভাবে *সংসদ সদস্যদের* জন্য প্রযোজ্য এবং যেগুলো *পুরো সংসদের* ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলোকেও আরো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন: ব্যক্তি সংসদ সদস্যদের বেলায় প্রযোজ্য বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির ক্ষেত্রগুলো হলো: (ক) বাক স্বাধীনতা, (খ) দেওয়ানী মামলায় গ্রেফতার থেকে অব্যাহতি, (গ) জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি, এবং (ঘ) সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি। এগুলো মূলত দায়মুক্তি সম্পর্কিত অধিকার এবং এগুলোর ফলে ব্যক্তি সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র ১৭২-১৭৬ ধারায় এ সকল বিষয় সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

পুরো সংসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার ও ক্ষমতাগুলো হলো: (ক) শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার অধিকার। কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করার বা সংসদ অবমাননার জন্য শাস্তি প্রদান, যার মধ্যে দুর্নীতি, অপকর্ম ও অসদাচারণের জন্য সংসদ সদস্যদের বহিষ্কার এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সংসদের এ ধরনের অধিকারকে শাস্তিমূলক ক্ষমতা বলা হয়। (খ) সংসদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের ব্যবস্থাপনা বা কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ক্ষমতা। (গ) সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা। (ঘ) তদন্ত করার, সাক্ষী এবং রেকর্ডপত্র তলব করার ক্ষমতা। আমাদের জাতীয় সংসদের *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র ২০১-২০৩ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। (ঙ) সাক্ষীদের শপথ প্রদানের ক্ষমতা। আমাদের *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র ২০৪-২০৫ ধারা এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। (চ) মানহানিকর বিষয়ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন কাগজপত্র প্রকাশ করার ক্ষমতা।

বিষয়টি সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ অধিকার (privileges), ক্ষমতা (powers) এবং দায়মুক্তির (immunities) মধ্যে বিভাজন করা আবশ্যক, যদিও অনেকসময় তা করা হয় না। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সরকারের মতে: [æ... the right of the House to have absolute control of its internal proceedings may be considered as its privilege, its right to punish one for contempt may be more properly described as its power, while the right that no member shall be liable for anything said in the House may

be really an immunity." [বিশেষ রেফারেন্স অনুচ্ছেদ ১৪৩, এআইআর (১৯৬৫) এসসি ৭৪৫] ('নিজস্ব আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংসদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে *বিশেষ অধিকার* হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তিকে সংসদের অধিকার ক্ষুন্ন বা অবমাননার দায়ে শাস্তি দেয়ার অধিকারকে *ক্ষমতা* হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। সংসদে যে কোনো কিছু বলার জন্য কোনো সংসদ সদস্য দায়ী না হবার অধিকারই *দায়মুক্তি*।')

বিশেষ অধিকারকে আরো দু'ভাগে বিভাজন করা যায়: সংসদের গঠন (composition) সম্পর্কিত অধিকার এবং নিজস্ব কার্যক্রম বিনা বাধায় স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার অধিকার। সংসদের গঠন বিষয়ক অধিকার বলতে কারা সংসদ সদস্য হতে পারবেন বা কাদেরকে সদস্য হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়, অর্থাৎ সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কিত ক্ষমতাকে বুঝায়। তবে সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা লিখিত সংবিধান এবং আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকার ফলে এটি সংসদের বিশেষ অধিকারের মধ্যে পড়ে না। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে ও *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন ২০০৯*-এর ১২ ধারায় সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে, নিজস্ব কার্যক্রম ও কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সংসদের বিশেষ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় অসহযোগিতা বা বাধা প্রদান করলে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংসদের অধিকার ক্ষুন্ন বা সংসদ অবমাননার (contempt) অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংসদের রয়েছে। এ অধিকারের আওতায় অসদাচারণের ও সংসদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার অভিযোগে সংসদ নিজ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের, এমনকি তাঁদেরকে সংসদ থেকে বহিষ্কারের এখতিয়ারও রাখে, যদিও এ ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, সংসদের শাস্তিমূলক ক্ষমতা দু'ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংসদ অবমাননার দায়ে বাইরের ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার এখতিয়ার সংসদের রয়েছে। বাইরের ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দেয়া যায় যদি তাঁরা সংসদীয় কিংবা সংসদীয় কমিটির কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে সংসদ নিজ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, যদি তাঁরা কোনোরূপ অসদাচারণে লিপ্ত হন, যা সংসদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। অর্থাৎ উশৃঙ্খল, ঔদ্ধত্যপূর্ণ এবং দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়ার কারণে, যা পুরো প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাহানি করে, সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বহু নজির অন্যদেশে রয়েছে। অর্থাৎ সংসদ সদস্যদের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরাধী কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁদেরকে দায়বদ্ধ করে শাস্তির ব্যবস্থা করা সংসদীয় বিশেষ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

২.০ আমাদের সাংবিধানিক বিধান

আমাদের সংবিধানে সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি সম্পর্কিত একটি অনুচ্ছেদ – অনুচ্ছেদ ৭৮ – রয়েছে। এছাড়াও অনুচ্ছেদ ৭৬-ও, বিশেষত ৭৬(২)(গ) এবং ৭৬(৩) এক্ষেত্রে আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

'৭৮(১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যাস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না। (৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ–অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।'

অনুচ্ছেদ ৭৬ সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত এ অনুচ্ছেদের বিধানগুলি হলো: '৭৬(২)(গ) জন-গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।' '৭৬(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের; (খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।'

সংবিধানের ৭৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনের দ্বারা সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি নির্ধারণ ও কার্যকারিতা প্রদান করার কথা। কিন্তু অদ্যাবধিও আমাদের জাতীয় সংসদ এ ধরনের কোনো আইন প্রণয়ন করে নি। তবে *কার্যপ্রণালী-বিধি*, যা সংসদ প্রণীত একটি আইন, সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদকে কার্যকারিতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জাতীয় সংসদের *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র ২২তম অধ্যায় সংসদের, কোনো কমিটির এবং ব্যক্তি সাংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত। এগুলো হলো:

'১৭২। কোন সদস্য ফৌজদারী অভিযোগে বা অপরাধে গ্রেপ্তার হইলে কিংবা কোন আদালত কর্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বা কোন নির্বাহী আদেশক্রমে আটক হইলে ক্ষেত্রমত গ্রেপ্তারকারী বা দণ্ডদানকারী বা আটককারী কর্তৃপক্ষ বা জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত যথাযথ ফরমে অনুরূপ গ্রেপ্তার, দণ্ডাজ্ঞা বা আটকের কারণ বর্ণনাপূর্বক অবিলম্বে অনুরূপ ঘটনা স্পীকারকে জানাইবেন।

'১৭৩। কোন সদস্য গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ডপ্রাপ্তির পর আপীলের বিবেচনা সাপেক্ষ জামিনে মুক্ত হইলে বা অন্যভাবে মুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ঘটনাও তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত যথাযথ ফরমে স্পীকারকে জানাইবেন।

'১৭৪। স্পীকারের অনুমতি ব্যতিরেকে সংসদের সীমানার মধ্যে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যাইবে না।
'১৭৫। স্পীকারের অনুমতি ব্যাতিরেকে সংসদের সীমানার মধ্যে কোনরূপ দেওয়ানী বা ফৌজদারী পরোয়ানা জারী করা হইবে না।
'১৭৬। ১৭২ বা ১৭৩ বিধি মোতাবেক পত্র পাইবার পর স্পীকার যথাশ্রীঘ্র সংসদ অধিবেশনে থাকিলে সংসদে তাহা পাঠ করিবেন, কিংবা সংসদ অধিবেশন না চলিলে সদস্যদিগের অবগতির জন্য তাহা প্রচার করার নির্দেশ দিবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কোন সদস্যের জামিনে বা আপীলে খালাস হওয়ার সংবাদ যদি মূল গ্রেপ্তার সংসদকে জ্ঞাপনের পূর্বে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনুরূপ গ্রেপ্তার বা পরবর্তী মুক্তি বা খালাসের সংবাদ স্পীকার সংসদকে না জানাইলেও চলিবে।'

এছাড়াও সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি, বিশেষত ২০১ থেকে ২০৫ পর্যন্ত বিধিগুলো, এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। বিধিগুলো হলো:
'২০১। কমিটি কাজ শুরু করিলে কমিটির সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের অফিসারবৃন্দ ছাড়া অন্য সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করিবেন।
'২০২। (১) সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুয়ায়ী কোন সাক্ষীকে ডাকা যাইবে এবং তিনি কমিটিকে সকল দলিল দাখিল করিবেন। (২) কমিটি স্বীয় বিবেচনায়, প্রদত্ত যে কোন সাক্ষ্য-বিষয়কে গোপনীয় অথবা একান্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন। (৩) কমিটির অনুমোদন না লইয়া কমিটিতে পেশ করা হইয়াছে, এমন কোন দলিল ফেরৎ লওয়া চলিবে না, অথবা উহার পরিবর্তন করা চলিবে না।
'২০৩। রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা কমিটির থাকিবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা প্রদত্ত কোন দলিল কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় কিনা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বিষয়টি স্পীকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবেঃ
আরও শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে এই কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।
'২০৪। (১) কমিটি আহুত সাক্ষীকে শপথ দান করিতে পারিবেন। (২) শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ
'আমি,.....সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব তাহা সর্বৈব সত্য; এবং আমি কোন বিষয় গোপন করিব না; এবং আমার সাক্ষ্যের কোন অংশ অসত্য হইবে না।
'২০৫। কমিটিতে উপস্থিত সাক্ষীর সাক্ষ্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইবেঃ (১) সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার পূর্বে কমিটি সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে এমন প্রশ্নাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। (২) এই বিধির (১) উপ-বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সভাপতি প্রথমে সাক্ষীকে এমন সব প্রশ্ন অথবা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায় পরীক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত মনে হইবে। (৩) সভাপতি কমিটির অন্যান্য সদস্যকে এক এক করিয়া অন্য সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। (৪) পেশ করা হয় নাই এই ধরনের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় পেশ করিবার জন্য সাক্ষীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সাক্ষীর বিবেচনামতে কমিটির গোচরে আনা প্রয়োজনীয় এমন বিষয়গুলিও পেশ করা যাইবে। (৫) কমিটি শ্রুত সাক্ষ্যের কার্য-বিবরণীর একটি হুবহু রেকর্ড রক্ষা করিবেন। (৬) কমিটির সকল সদস্যকে উক্ত কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য সরবরাহ করা যাইবে।'

৩.০ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

সংসদ সদস্যদের দায়মুক্তির বিধানগুলো পৃথিবীর সব দেশেই সচরাচর বিদ্যমান। কিন্তু বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করার কারণে শাস্তি প্রদানের, বিশেষত বহিষ্কারের নজির অনেকটা সীমিত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটেনে অনেককেই শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, যদিও বিংশ শতাব্দীতে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেন্ট এ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যতোটুকু জানা যায়, ১৬৬৭ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত মোট ৬০ জন সদস্যকে বৃটিশ পার্লামেন্ট থেকে বিভিন্ন কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক দেশেও বহিষ্কারের ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়। অনেক দেশের সংবিধানেও সংসদকে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১ যুক্তরাষ্ট্রের আইন

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বহিষ্কারের ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের পঞ্চম ধারার (২) উপ-ধারায় বলা হয়েছে: 'Each House may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior, and, with the concurrence of two-thirds, expel a member.' ('সংসদের প্রত্যেক কক্ষই তার কার্যপ্রণালী-বিধি নির্ধারণ, বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য নিজ সদস্যদেরকে শাস্তি প্রদান, এবং দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিতে কোনো সংসদ সদস্যকে বহিষ্কার করতে পারবে।') যুক্তরাষ্ট্রের আদালতও কংগ্রেস ও সিনেটের এ অধিকারের প্রতি সমর্থন প্রদান করেছে। আদালতের মতে, সংসদের সিদ্ধান্তই বহিষ্কারের কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত। ১৭৯৭ সালে উইলিয়াম ব্লাউন্ট নামে এক সিনেট সদস্যকে সিনেটের হিসেবে কর্মকাণ্ডের বাইরে অসদাচারণের দায়ে বহিষ্কারের রায়ে আদালত বলেন: ... expulsion power 'extends to all cases where the offence is such as in the judgment of the Senate is inconsistent with the trust and duty of a member.' ('বহিষ্কারের ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে অভিযুক্তের অপরাধ সিনেটের বিবেচনায় একজন সদস্যের প্রতি আস্থা ও তাঁর কর্তব্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।')

৩.২ অস্ট্রেলিয়ান আইন

অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে সংসদের উভয় কক্ষকে সংসদের এবং সংসদীয় কমিটিগুলোর ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে তা নির্ধারণের আগে কমনওয়েলথ সৃষ্টির সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্ট, তার সদস্যগণ ও

কমিটিসমূহের এ সম্পর্কিত অধিকার অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে *পার্লামেন্টারী প্রিভিলেজ এক্ট, ১৯৮৭* (ধারা ৮)-এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বহিষ্কারের ক্ষমতা রহিত করা হয়।

১৯৮৭ সালে ক্ষমতাটি রহিত করার আগে অস্ট্রেলিয়ায় সংসদ সদস্যদের বহিষ্কারের নজির রয়েছে। যেমন, ১৯২০ সালে হিউ মাহোন নামের একজন সদস্যকে আয়ারল্যান্ডে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নগ্ন আক্রমণ করার কারণে প্রতিনিধি পরিষদ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

৩.৩ কানাডিয়ান আইন

কানাডার সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে সংসদের উভয় কক্ষকে আইনের মাধ্যমে বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তি নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে এগুলো বৃটিশ পার্লামেন্টের এবং সেখানকার সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বেশি হবে না। *স্পীকার বনাম কানাডিয়নি ব্রডকাস্টিং করপোরেশন* মামলার রায়ে [(১৯৯৩) ১ এসসিআর ৩১৯] সুপ্রিম কোর্ট সংসদের বিশেষ অধিকারের বিষয়টিকে 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' (doctrine of necessity) বা প্রয়োজনীয়তার আলোকে দেখেন। অর্থাৎ সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ অধিকার প্রয়োজনীয় বলেই ধরে নেয়া হয়। এছাড়াও আদালত কানাডিয়ান আইন প্রণেতাগণ আইনসভা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাকে তাদের অন্তর্নিহিত বিশেষ অধিকার (inherent privilege) বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট *ফ্রেড হার্ভি বনাম এটর্নি জেনারেল অব নিউ ব্রান্সউইক* মামলার রায়ে [(১৯৯৬) ২ এসসিআর ৮৭৬] নিউ ব্রান্সউইক অঙ্গরাজ্যের একজন প্রতিনিধিকে ১৬ বছরের এক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে ভোটদানে প্ররোচিত করার অভিযোগে শুধু বহিষ্কারই করেনি, তাঁকে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অযোগ্য ঘোষণা করে। মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেন: 'If democracies are to survive, they must insist upon the integrity of those who seek and hold public office. They cannot tolerate corrupt practices within the legislature. Nor can they tolerate electoral fraud. If they do, two consequences are apt to result. First, the functioning of the legislature may be impaired. Second, public confidence in the legislature and the government may be undermined. No democracy can afford either.' ('গণতন্ত্র যদি টিকে থাকতে হয়, তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সততার ব্যাপারে অনমনীয় হতে হবে। সংসদের ভেতরে দুর্নীতিমূলক আচরণ সহ্য করা যাবে না। নির্বাচনী প্রতারণায়ও তা সহ্য করা যাবে না। যদি তা করা হয়, তাহলে দু'টি পরিণতি ঘটবে। প্রথমত, সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত হবে। দ্বিতীয়ত, জনগণ সংসদ এবং সরকারের ওপর আস্থা হারাবে। এ দু'টোর কোনোটাই গণতন্ত্রের জন্য মঙ্গলকর নয়।')

৩.৪ বৃটিশ আইন

যুক্তরাজ্যে লিখিত সংবিধান নেই। তাই সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তি বৃটিশ সাংবিধানিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুক্তরাজ্যে বিরাজমান আইন ও ঐতিহ্যে সংসদ সদস্যদের *বহিষ্কার* এবং তাদের *অযোগ্যতার* বিষয়টির মধ্যে বিভাজন সুস্পষ্ট হয়েছে। কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনে 'আনফিট' বা অনুপযুক্ত (অযোগ্য নয়) হয়ে পড়লে বৃটিশ পার্লামেন্ট তাঁকে বহিষ্কার করতে পারে – অনুপযুক্ত হওয়ার কারণ তাঁর অসদাচারণ, যা তাঁকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে অযোগ্য নাও করতে পারে। তাই তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করার এখতিয়ার পার্লামেন্টের নেই। ফলে একজন বহিস্কৃত সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেন, যা ঘটেছিল ১৭৬৯ সালে জন উইলক্স-এর ক্ষেত্রে।

বৃটিশ জুরিসপ্রুডেন্সে *আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত অধিকার* এবং 'রিজুলিউশান' বা *প্রস্তাব আকারে গৃহীত বিশেষ অধিকারের* মধ্যে বিভাজন করা হয়। প্রস্তাব আকারে গৃহীত অধিকারের ক্ষেত্রে বৃটিশ আদালত 'ডক্ট্রিন অব নেসেসিটি' বা প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ড উদ্ভাবন করে। এর মাধ্যমে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার দিকটি দেখা হয় না, বরং দেখা হয় শাস্তিমূলক পদক্ষেপটি না নেয়া হলে সংসদের মর্যাদা (dignity), সততা (integrity) ও কার্যকারিতা (efficiency) ব্যাহত হবে কি না। তাই যুক্তরাজ্যে অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনা সত্ত্বেও অতীতে বহু সংসদ সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ওই দেশে সংসদের শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিচারিক পর্যালোচনার (judicial review) পরিধিও সীমিত।

৩.৫ ভারতীয় আইন ও অভিজ্ঞতা

ভারতীয় সংবিধানিক বিধানও অস্ট্রেলিয়ার মতো। ভারতীয় সংবিধানের ১০৫ ও ১২২ অনুচ্ছেদে লোকসভা ও রাজ্যসভা এবং তাদের সদস্যদের ক্ষমতা, বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি সম্পর্কিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবিধানে এ সকল অধিকার আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত করার কথা বলা আছে। তবে আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত – যা অদ্যাবধিও হয়নি – ভারতের ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোগ করা ক্ষমতা ও অধিকারগুলো প্রযোজ্য হবে। ১৯৭৮ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৪৪তম সংশোধনীর মাধ্যমে একই অধিকার অব্যাহত রাখা হয়েছে। ভারতীয় প্রাদেশিক পরিষদসমূহের জন্যও একই অধিকার ও ক্ষমতা প্রযোজ্য (অনুচ্ছেদ ১৯৪ ও ২১২)।

প্রতিবেশী ভারতে সংসদের বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করার কারণে বহুবার বিভিন্ন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। লোকসভা, রাজ্যসভা ও প্রাদেশিক পরিষদ থেকে অসদাচারণের অভিযোগে অনেক সদস্যদের বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৫১ সালে সংসদীয় সদস্যপদকে অপব্যবহারের অভিযোগে এইচ জি মুডগাল নামে এক লোকসভার সদস্যকে বহিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটির তদন্তের ভিত্তিতে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কার প্রস্তাবটি লোকসভায় উত্থাপনকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন: 'Apart from that, even if the Constitution had made no reference to this, this House as a sovereign Parliament must have inherently the right to deal with its own problems as it chooses and I cannot imagine anybody doubting that fact.' ('এছাড়াও, সংবিধানে বলা না থাকলেও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই সংসদের নিজের ইচ্ছামতো তার নিজস্ব সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা রয়েছে। আমি কল্পনাও করতে পারি না, কেউ এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করবে।')

পরবর্তীতে ১৫ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে সুব্রমণিয়ম সোয়ামিকে রাজ্যসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ থেকেও বেশ কয়েকজন সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়।

১৯৭৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর ভারতীয় লোকসভা থেকে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে বিচার প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদান, হুমকি প্রদান, নাজেহাল করার এবং মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগে বহিষ্কার ও কারাগারে প্রেরণ করা হয়। একইসাথে আর কে দাওয়ান ও ডি সেন নামে আরো দু'জন লোকসভা সদস্যকেও বহিস্কৃত করা হয়। সংসদ নেতা মুরারজী দেশাই লোকসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে, ৭ মে, ১৯৮১ সালে, লোকসভার 'রিজুলিউশন' বা প্রস্তাবের মাধ্যমে অবশ্য মিসেস গান্ধী ও তাঁর দুই সহকর্মীর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

ভারতীয় সংসদ থেকে বহিষ্কারের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখে, যখন ১১ জন সংসদ সদস্যকে অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন উত্থাপনের এবং স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয়ে অনিয়মের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। এদের দশজন ছিলেন লোকসভার এবং একজন রাজ্যসভার সদস্য। এদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন বিজেপি'র, তিনজন বিএসপি'র, একজন কংগ্রেসে'র এবং একজন আরজেডি'র সদস্য। পরবর্তীতে ২১ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে বাবুভাই কাতারা নামে আরেকজন লোকসভার বিজেপি'র সদস্যকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলের পাসপোর্ট ব্যবহার করে অন্য দু'জনকে বিদেশে পাচার করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়।

৪.০ আদালতের সিদ্ধান্ত

যুক্তরাজ্যে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। তাই দাবি করা হয় যে, সরকারের তিনটি ব্রাঞ্চের মধ্যে পার্লামেন্টই মূখ্য। তাই পার্লামেন্টের আইনের ক্ষেত্রে অনেকটাই শেষ কথা বলার অধিকার। এছাড়াও ব্রিটিশ হাউজ অব লর্ডস একটি বিচারিক আদালত। কিন্তু আমাদের মতো দেশে, যেখানে লিখিত সংবিধান রয়েছে এবং সংসদ বৃটিশ পার্লামেন্টের মতো 'কোর্ট অব রেকর্ডস' (court of records) বা নথিসংরক্ষণকারী আদালত নয়, সে সকল দেশে সংবিধানই 'সুপ্রিম' বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংবিধানের রক্ষক হিসেবে এর ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার উচ্চ আদালতের।

জনাব কেশব সিংকে উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক পরিষদ কর্তৃক পরিষদ অবমাননার দায়ে জেলে প্রেরণের এবং এ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির কারণে ১৯৬৪ সালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রেরিত একটি রেফারেন্সের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ মতামত [এআইআর(১৯৬৫)এসসি ৭৪৫] দেন যে, বৃটিশ পার্লামেন্টের মতো ভারতীয় সংসদ কোর্ট অব রেকর্ডস্ নয়। তাই কাউকে সংসদ অবমাননার দায়ে শাস্তি দেয়ার এখতিয়ার ভারতীয় পার্লামেন্টের নেই। আদালত আরো বলেন: '... it is necessary to remember that though our Legislatures have plenary powers, they function within the limits prescribed by the material and relevant provisions of the Constitution. In a democratic country governed by a written Constitution, it is the Constitution which is supreme and sovereign. Therefore, there can be no doubt that the sovereignty which can be claimed by the Parliament in England, cannot be claimed by any Legislature in India in the literal absolute sense.' ('...এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও সংসদের অগাধ ক্ষমতা রয়েছে, তবুও সংসদকে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের বিধানের আওতার মধ্যে থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। লিখিত সংবিধানের আওতায় পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধানই মূখ্য ও সার্বভৌম। তাই এতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট যে সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে, ভারতে কোনো সংসদই আক্ষরিত ও নিরঙ্কুশ অর্থে তা দাবি করতে পারে না।')

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট সাংবিধানিক বেঞ্চের এই রায়ের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীতে মধ্য প্রদেশ ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট দ্বিমত পোষণ করে রায় দেন যে, ভারতীয় লোকসভা, রাজ্যসভা ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের তাদের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার এবং তাঁদেরকে বহিষ্কার করার এখতিয়ার রয়েছে।

তবে সংসদ সদস্যদের বহিষ্কারাদেশ সম্পর্কিত ভারতীয় পার্লামেন্টের এখতিয়ার নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে প্রদত্ত রায়ে। ২০০৫ সালে ১১ জন সংসদ সদস্যদের বহিষ্কারাদেশের পর রাজা রাম পাল নামে একজন লোকসভার সদস্য আদালতে এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন [*রাজা রাম পাল বনাম স্পীকার ও অন্যান্য*, রিট পিটিশন (সি) নং. ১২৯ অব ২০০৬]। প্রধান বিচারপতি ওয়াই কে সাবারওয়ালের নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ মামলার রায়ে মূলত দু'টি বিষয় খতিয়ে দেখা হয়: সংসদের কি তাদের নিজ সদস্যদের বহিষ্কারের ক্ষমতা আছে? সংসদের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার এখতিয়ার কি আদালতের রয়েছে? পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার দীর্ঘ ৪-১ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে আদালত দু'টি প্রশ্নেরই ইতিবাচক জবাব দেন এবং রাজা রাম পালের মামলা খারিজ করে দেন। মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে বলা হয়: 'The expediency and the necessity of exercise of power or privilege by the legislature

are for the determination of the legislative authority and not for determination by the courts.' ('সংসদীয় ক্ষমতা এবং বিশেষ অধিকার প্রয়োগের উপযোগীতা ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের এখতিয়ার সংসদীয় কর্তৃপক্ষের। এটি আদালতের বিষয় নয়।') অর্থাৎ ভারতীয় পার্লামেন্টের তার সদস্যদের বহিষ্কারের ক্ষমতা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে দ্বিমতপোষণকারী বিচারক আর ভি রাভিনড্রানের অভিমতও প্রণীধানযোগ্য। তিনি বলেন যে: 'Unlike British Parliament, Indian Parliament is not sovereign. It is the Constitution which is supreme and sovereign and Parliament will have to act within the limitations imposed by the Constitution.' ('বৃটিশ পার্লামেন্টের মতো, ভারতীয় পার্লামেন্ট সার্বভৌম নয়। সংবিধানই মূখ্য ও সার্বভৌম এবং পার্লামেন্টকে সংবিধানে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।') তিনি আরো বলেন: '... By no stretch of imagination, the power to expel a member can be considered as an 'incidental' matter. If such a power was to be given (to the legislature by the framers of the Constitution), it would have been specifically mentioned (in the Constitution).' [phrases in parentheses are added] ('...এটি কল্পনা করা দুরূহ যে, একজন সংসদ সদস্যকে বহিষ্কার করা একটি 'লঘু' বিষয়। যদি (সংবিধান প্রণেতারা সংসদকে) ক্ষমতা দিতে চাইতেন, তাহলে তা (সংবিধানে) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হতো।']

সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত 'রিভিউ' বা পর্যালোচনা করার এখতিয়ার কি আদালতের রয়েছে? এক্ষেত্রেও রাজা রাম পালের মামলার রায়ের আগে আদালতের সিদ্ধান্ত ছিল বিভক্ত। কেশব সিংয়ের মামলার কারণে রাষ্ট্রপতির প্রেরিত রেফারেন্সের প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক পরিষদের সিদ্ধান্তটির আইনি বৈধতা পর্যালোচনা করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে বলে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ ১৯৬৫ সালে মতামত দেন। পক্ষান্তরে *পি ভি নরসীমা রাও বনাম স্টেট* মামলায় [(১৯৯৮)৪এসসিসি] ১৯৯৮ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, উৎকোচ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোট দেওয়ার বিষয়ে 'পার্লমেন্টারি প্রসিডিংস' বা সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার আদালতের নেই। আদালত সুস্পষ্টভাবে বলেন: 'The bribe-taker MPs who have voted in Parliament against the non-confidence motion are entitled to protection of Article 105(2) and are not answerable to Court of Law for alleged conspiracy and agreement.' ('উৎকোচগ্রহণকারী সংসদ সদস্যগণ, যাঁরা অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সংবিধানের ১০৫(২) অনুচ্ছেদের অধীনে দায়মুক্তি পেতে পারেন। তাঁরা ষড়যন্ত্র ও সমঝোতার অভিযোগে আদালতে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।') প্রসঙ্গত, আমাদের সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদের বিধানও অনেকটা ভারতীয় সংবিধানের ১০৫(২) অনুচ্ছেদের সমতুল্য।

আদালতের এখতিয়ার প্রসঙ্গে রাজা রাম পাল মামলার রায়ে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট ভিন্ন অবস্থান নেন। আদালত বলেন যে, সংসদীয় কার্যক্রমের নিরঙ্কুশ দায়মুক্তির দাবির কোনো ভিত্তি নেই। মৌলিক অধিকার লংঘন, 'নেচারাল জাস্টিস' বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের ধারণার সাথে সঙ্গতিহীনতা, 'ইর্‌রেশনালিটি' বা অযৌক্তিকতা, 'পারভারসিটি' বা বিকৃতি কিংবা গুরুতর বেআইনি বা সংবিধান পরিপন্থি সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যালোচনা করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২২ ও ২১২ অনুযায়ী, কার্যপ্রণালীতে অনিয়মের অভিযোগে আদালতের দারস্থ হওয়ার সুযোগ নেই। এছাড়াও আদালত তথ্য ও দলিলপত্রের সত্যতা এবং পর্যাপ্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না বা সংসদের বিবেচনার ওপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে দেবে না। উপরন্তু 'প্রপোরশনালিটি' বা লঘু অপরাধের জন্য গুরুদণ্ড দেয়ার অভিযোগেও আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অবকাশ নেই। অর্থাৎ সীমিত ক্ষেত্রে সংসদীয় সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ রায়ের মাধ্যমে সংসদের ক্ষমতা ও বিচার বিভাগের এখতিয়ার বিষয়ে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আদালতের দৃষ্টিতে বহিষ্কারাদেশ প্রদানের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের কড়াকড়িও অনেকটা শিথিল। এ প্রসঙ্গে ওয়েসটেল ডাব্লিউ উইলোভি তাঁর *Constitutional Law of the United States* গ্রন্থে বলেন,: 'In determining whether or not a member of congress has been guilty of such acts as to warrant his expulsion the House concerned does not sit as a criminal trial court, and is not therfore, bound by the rules of evidence, and the requirements as the certitude of guilt which prevail in a criminal character, but only as to unfitness for participation in the deliberation and decisions of congress.' (কোনো সদস্যের কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হতে পারেন এমন অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ নিশ্চিতভাবে নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা নেই, কারণ কংগ্রেস ফৌজদারি আদালত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে না। এক্ষেত্রে 'রুলস অব এভিডেন্স' বা সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণেরও বাধ্যবাধকতা নেই।) *রাজা রাম পাল বনাম স্পীকার* মামলার রায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণ আরো সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, যদি সিদ্ধান্তের সমর্থনে অন্তত কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে, তাহলে আদালত সংসদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। ('...this Court shall not interfere so long as there is some relevant meterial sustaining the action.') এছাড়াও সংসদের বহিষ্কারের ক্ষমতা অপব্যবহারের ব্যাপারেও আদালত উদ্বিগ্ন নন।

৫.০ আমাদের সাম্প্রতিক ইস্যুসমূহ

আমাদের জাতীয় সংসদের সামনে বর্তমানে সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত দু'টি বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হলো সাবেক স্পীকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ তদন্তের জন্য মাননীয় স্পীকার ইতোমধ্যে একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি এবং একাধিক সাব-কমিটি গঠন করেছেন। এরইমধ্যে একটি সাব-কমিটি ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির

কারণে নৈতিক স্খলনের অপরাধের অভিযোগ তুলে জাতীয় সংসদ থেকে তাঁর বহিষ্কারের সুপারিশ করেছেন বলে সংবাদপত্রে রিপোর্ট বেরিয়েছে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায়, সংসদীয় বিশেষ কমিটির সামনে ১০ জুন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁর প্রতি সমন জারি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো সংসদীয় 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি' ও দুদকে'র মধ্যে কমিটির এখতিয়ার সম্পর্কিত একটি বিরোধ। কয়েক মাস আগে ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীরের সভাপতিত্বে গঠিত উপরিউক্ত কমিটি দুদকের বিদায়ী চেয়ারম্যান লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী, অপর দু'জন কমিশনার ও সাবেক সচিবকে কমিশনের গত দু'বছরের কার্যক্রম সম্পর্কিত দলিলপত্রসহ ১২ এপ্রিল কমিটির সামনে তলব করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদেরকে তলব করা আইনসঙ্গত হয়নি বলে দাবি করে কমিটির সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কমিটি তাঁদেরকে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে ২ জুনের মধ্যে জবাব প্রেরণের জন্য বলে। জবাব সন্তোষজনক না হলে কমিটি তাঁদের বিরুদ্ধে সংসদ অবমাননার অভিযোগ এনে জেল জরিমানার হুমকিও প্রদান করে।

ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের বিরূদ্ধে তদন্ত এখনো শেষ হয় নি। তদন্ত শেষে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পুরো সংসদকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা আশা করি যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগগুলোর সম্পর্কে কমিটি ও সংসদ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা আরো আশা করি যে, সংশ্লিষ্টরা সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে কোনোরূপ খারাপ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি না হয়।

এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি নাগরিকদের জন্য প্রাসঙ্গিক, তা হলো – অসদাচারণের দায়ে একজন সংসদ সদস্যকে বহিষ্কারের ক্ষমতা কি আমাদের জাতীয় সংসদের আছে? বাংলাদেশ সংবিধানে কোনো সংসদ সদস্যকে বহিষ্কার করার কোনো বিধান নেই। এ ব্যাপারে কোনো দৃষ্টান্তও আমাদের দেশে নেই। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা থাকলেও, সংসদীয় বিশেষ অধিকার বিষয়ে কোনো আইনও আমাদের জাতীয় সংসদ অদ্যাবধি প্রণয়ন করে নি। তবে সাবেক এটর্নি জেনারেল মাহমুদুল ইসলাম তাঁর *Constitutional Law of Bangladesh* বইতে লিখেছেন: 'Privileges will have no meaning at all unless Parliament is conceded the power to take action against the breach of privilege. Thus the question is not one of existence but of the extent of the power.' ('বিশেষ অধিকারের বিষয়টি অর্থহীন, যদি তা ক্ষুন্ন করার কারণে সংসদের ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতার স্বীকৃতি না দেয়া হয়। তাই ক্ষমতা আছে-কি-নাই তা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো কতটুকু আছে।') তাই এক্ষেত্রে অন্য দেশের কনভেনশন বা প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করা আমাদের জন্য প্রয়োজন হবে – পৃথিবীর অনেক দেশেই সংসদ সদস্যদের বহিষ্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আরো রয়েছে, সংসদ সদস্য নন, এমন ব্যক্তিদেরকে শুধুমাত্র সংসদের বা সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা প্রদানের কারণে শাস্তি প্রদানের উদাহরণ।

লক্ষ্যণীয় যে, যে কোনো বিষয়ে স্বাধীনভাবে সংসদে কথা বলার জন্য আমাদের সংসদ সদস্যদেরকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। আরো দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে, স্বাধীনভাবে রিপোর্ট ও কার্যধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কারণে সংসদ সদস্যগণ তাঁদের দলের বিরুদ্ধে সংসদে অবস্থান নিতে পারেন না। বস্তুত এ অনুচ্ছেদের কারণে মন্ত্রী পরিষদ সংসদের কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে, সাংসদ সদস্যরাই দায়বদ্ধ হয়ে পড়েছেন দলীয় নেতা-নেত্রীদের কাছে। অর্থাৎ সংবিধানের ৭৬ ও ৭৮ অনুচ্ছেদ সংসদকে নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করলেও, ৭০ অনুচ্ছেদ সে ক্ষমতা অনেকাংশে কেড়ে নিয়েছে। তাই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। সংশোধনের ক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে এ অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির দুঃখজনক প্রেক্ষাপট।

সংসদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত আমাদের সাংবিধানিক বিধানের সাথে কানাডার বিধানের অনেকটা মিল রয়েছে। কেনেডিয়ান সংবিধানে আইনের মাধ্যমে সংসদীয় বিশেষ অধিকার নির্ধারণের কথা বলা রয়েছে। আরো বলা রয়েছে যে, আইন করে বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ অধিকারের বেশি ক্ষমতা কেনেডিয়ান সংসদ সদস্যদেরকে প্রদান করা যাবে না। অর্থাৎ কেনেডিয়ান সংবিধানে বলা নেই যে, বৃটিশ পার্লমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ অধিকার, আইন প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত, কেনেডিয়ান সংসদ সদস্যরা ভোগ করবেন। তেমনিভাবে আমাদের সংবিধানেও এমন কোনো বিধান নেই। তাই কেনেডিয়ান প্রতিনিধি পরিষদ যদি, তাদের সদস্যদেরকে বহিষ্কার করতে পারে, তাহলে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করে, আমাদের জাতীয় সংসদের পক্ষেও তা করা সম্ভব।

এ প্রসঙ্গে টমাস এম কুলি'র *A Treatise on the Constitutional Limitations* গ্রন্থ থেকে উদ্বৃতি দেয়া যেতে পারে: 'Each House has ... the power to punish members for disorderly behavior and other contempts of its authority, and also to expel a member for any cause which seems to the body to render it unfit that he continues to occupy one of its seats. This power is sometimes conferred by the constitution, but it exists whether expressely conferred or not. It is a necessary and incidental power, to enable the house to perform its high functions and is necessary to the safety of the State. It is a power of protection.' ('প্রত্যেক কক্ষেরই তাদের নিজস্ব সদস্যদেরকে বিশৃঙ্খল আচরণ এবং অন্য ধরণের অবমাননার জন্য শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তাদের যে কোনো সদস্যকে বহিষ্কারের ক্ষমতা রয়েছে, যদি তারা মনে করে যে, কোনো কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংসদে সদস্যপদ রাখার উপযোগী নন। এই ক্ষমতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবিধানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা না থাকলেও, এ ক্ষমতা বিদ্যমান। সংসদের মহৎ দায়িত্ব পালনের এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এটি প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক ক্ষমতা। এটি একটি রক্ষাকবচমূলক ক্ষমতা।')

এক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত বিশেষজ্ঞ এরেসকাইন মে'র উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: 'The distinctive mark of a privilege is its ancilliary character. The privileges of Parliament are rights which are 'absolutely necessary for the due execution of its powers'. They are enjoyed by inidvidual Members, because the House cannot perform its functions without unimpeded use of the services of its Members; and by its House for the protection of its Members and the vindication of its own authority and dignity.' ('বিশেষ অধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো এর সহায়ক চরিত্র। সংসদের বিশেষ অধিকার হলো সে সকল ক্ষমতা, যা তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নিরঙ্কুশভাবে অপরিহার্য। এগুলো ব্যক্তি সংসদ সদস্যরা উপভোগ করেন, কারণ সংসদ সদস্যদের বাধাহীন অবদান ছাড়া সংসদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। সংসদ সদস্যদের দায়মুক্তি এবং সংসদের ক্ষমতা ও সম্মানবোধ রক্ষার জন্যও সংসদের বিশেষ অধিকার অপরিহার্য।') অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিধান থাকুক বা না-থাকুক, অসদাচারণের দায়ে কোনো সদস্যকে বহিষ্কার করা সংসদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা। এর মূল উদ্দেশ্য সংসদের মর্যাদা রক্ষা এবং এর প্রতি জনগণের আস্থা নিশ্চিত করা, যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে।

সংসদীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি ও দুদকের বিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো – যে কোনো সংসদীয় কমিটি কি যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে তলব করতে পারে? এটি এখতিয়ারের প্রশ্ন। আইনগতভাবে এখতিয়ার থাকলে কমিটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তলব করতে পারে।

একথা সত্য যে, দুদক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নয়, তাই এটি সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা নেই। সম্ভবত আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের ধারণার মধ্যেই আসেনি যে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে কেনা আমাদের এই বাংলাদেশ একদিন পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্থ জাতির অমর্যাদা ও গ্লানি অর্জন করবে। তাই তাঁরা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় একটি দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেন নি। তবে এটি আইনের দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং এটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির এখতিয়ার বহির্ভুত।

কার্যপ্রণালী-বিধি ২৩৮ ধারার অধীনে 'চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য' সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সৃষ্টি। 'চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা করা' কমিটির কাজের অন্তর্ভুক্ত। আরো অন্তর্ভুক্ত 'চতুর্থ তফসিলে লিপিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে সরকারী হিসাব কমিটি এবং অনুমিত হিসাব কমিটিতে ন্যস্ত ঐসব কাজ করা, ... এবং যেসব কাজ সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটিতে প্রেরণ করিবেন, তাহা করা'। তবে 'যে বিশেষ আইন বলে কোন বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সেই আইন বলে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের বিবেচ্য বিষয়সমূহ' কমিটির তদন্তের এখতিয়ার বহির্ভূত। উল্লেখ্য যে, *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো পড়ে মনে হয় যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সৃষ্টি হয়েছে মূলত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির সুনির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদন্ত করার এবং সাক্ষী তলব করার এখতিয়ার রয়েছে। তবে *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র চতুর্থ তফসিলে উল্লেখিত কমিটির এখতিয়ারাধীন ২৩টি 'আইন/রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা স্থাপিত সরকারী প্রতিষ্ঠানে'র মধ্যে দুদক অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি চতুর্থ তফসিলের ২৫ নম্বরে উল্লেখিত 'এই বিধিসমূহ পাশের পর গঠিত অন্যান্য কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠান' কমিটির আওতাভুক্ত করার বিধানও দুদকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় – দুদককে কমিটির এখতিয়ার থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ দুদক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৪ সালে আর *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র সংশোধনের সর্বশেষ তারিখ ১১ জানুয়ারি, ২০০৭। অর্থাৎ দুদকের কার্যক্রম সংসদীয় স্থায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *আইন-শব্দকোষ* অনুযায়ী, দণ্ডবিধির ৪১ ধারা অনুসারে, 'বিশেষ আইন হইতেছে বিশেষ বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য আইন।' যেমন, রেলওয়ে আইন, আয়কর আইন ইত্যাদি। উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে 'দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা'র (আইনের মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত) লক্ষ্যে প্রণীত *দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪*-ও 'বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে'র লক্ষ্যে একটি বিশেষ আইন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। উপরন্তু, দুদকের তদন্ত 'সরকারী হিসাব কমিটি এবং অনুমিত হিসাব কমিটিতে ন্যস্ত' বা স্পীকার কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত বিষয় বলেও আমরা শুনি নি। এসব বিবেচনায়ও দুদকের এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কার্যক্রম তদন্ত করা কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা করা হবে আইনের লঙ্ঘন।

আরেকটি কারণেও দুদকের বিষয়ে কমিটির হস্তক্ষেপ বেআইনি। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান না হলেও, দুদক আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। দুদকের আইনের মুখবন্ধে এটিকে 'দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আইনের ৩(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে।' আইনের ২৪ ধারা অনুযায়ী, 'এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিশনারগণ এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।' কমিশন যাতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে লক্ষ্যে আইনের ১০(৩) ধারায় বলা হয়েছে, 'সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোন কমিশনারকে অপসারন করা যাইবে না।'

আইনের উপরিউক্ত বিধানাবলী দুদককে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জাতীয় সংসদের প্রত্যয়েরই প্রতিফলন। যে প্রেক্ষাপটে তা করা হয়েছে, তাও আজ বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। বহুদিন থেকেই আমাদের দেশে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ

করেছে এবং এটি এখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। ক্ষমতাধররা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে কিংবা পছন্দের ব্যক্তিদেরকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিলে বা ব্যক্তিগতভাবে নিলে দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমেই আমাদের সমাজে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে। দুর্নীতির 'রাজনীতিকরণ' এবং রাজনীতির 'দুর্নীতিকীকরণে'র ফলে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়ই দুর্নীতি আমাদের দেশে সর্বব্যাপি ও সর্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি আর দুর্নীতি আজ বহুলাংশে সমার্থক হয়ে গিয়েছে. ফলে অতীতের দুর্নীতি দমনের প্রচেষ্টা অনেকের কাছে 'রাজনীতি দমনে'র প্রচেষ্টা হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। আর রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করেই অতীতে দুর্নীতিরোধের সকল প্রচেষ্টা অকার্যকর করা হয়েছে। অনেকের ধারণা, এ ধরনের অপচেষ্টা রোধের লক্ষ্যেই জনদাবির প্রেক্ষিতে সংসদ দুদককে স্বাধীন করেছে এবং তাদের অপসারণের বিরুদ্ধে কঠোর বিধান করে দুদকের কমিশনারদেরকে নির্ভয়ে ও বিনাদ্বিধায় কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে, যদিও বিগত চারদলীয় সরকার কমিশনকে সম্পূর্ণ অকার্যকর করে রেখেছিল। বস্তুত, বর্তমানে দুর্নীতি যে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী রূপলাভ করেছে তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যেই সংসদ দুদককে স্বাধীন করেছে।

নিঃসন্দেহে দুদক একটি সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন, সরকারি কর্মকমিশন ইত্যাদিও সরকারি অর্থে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবিধান এগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে এবং এগুলোর কাজে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো সংসদীয় কমিটির নেই। আর সংসদে পাশ করা আইন দুদককে স্বাধীনতা দিয়েছে – দুদক নিজে এ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নি। কারণ দুদক ও সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনের মত 'ইনিস্টিটিউশানাস্ অব একাউন্টিবিলিটি' বা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রতিষ্ঠান। তাই *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র ২৩৮ ধারা ও চতুর্থ তফসিলের কথা বাদ দিলেও, আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনেও হস্তক্ষেপ করার এখতিয়ার সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির নেই। যেমন নেই বাংলাদেশ ব্যাংকে। এছাড়া আইনে দুদকের জবাবদিহিতার বিধানও রাখা হয়েছে। আইনে দুদকের পক্ষ থেকে বাৎসরিকভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতিবেদন পেশ করার এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করার বিধান রাখা হয়েছে। তবে দুদকের জবাবদিহিতার পদ্ধতিগত বিষয়টি অবশ্যই আবার বিবেচনা করা যেতে পারে।

সংসদীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ও দুদকের মধ্যেকার বিরোধের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা ও নৈতিকতার প্রশ্নও জড়িত। কমিটির চেয়ারম্যান দুদকের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি। নৈতিক, এমনকি আইনগত দিক থেকেও তিনি দুদকের বিরুদ্ধে বিচারকের আসনে বসতে পারেন না – প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মূসার মতে, দুদকের বিরুদ্ধে তিনি একাধারে জজ, প্রসিকিউটর ও জুরির আসনে বসেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে সন্দেহের উদ্রেক করে, কারণ *কার্যপ্রণালী-বিধি*'র চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ২৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য না করে তিনি তফসিলের তালিকা বহির্ভুত দুদকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। উল্লেখ্য যে, তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ বিমানসহ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ভারতীয় *রাজা রাম পাল বনাম স্পীকার* মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রণীধানযোগ্য: '... the procedure adopted by the two Houses of Parliament cannot be held to be suffering from any illegality, irrationality, unconstitutionality, violation of rules of natural justice or perversity.' ('...সংসদের দুই কক্ষ যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছে তা আইন-লঙ্ঘনতা, অযৌক্তিকতা, অসাংবিধানিকতা, স্বাভাবিক ন্যায়বিচারহীনতা বা বিকৃতির দোষে দুষ্ট নয়।') অর্থাৎ সংসদ এবং সংসদীয় কমিটির বিশেষ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধান এবং আইন সমুন্নত রাখার পাশাপাশি যৌক্তিকতা, ন্যায়বিচার ও বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। ড. মহিউদ্দীন খান আলমগীরের সভাপতিত্বে পরিচালিত সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটির দুদক সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত 'নেচারাল জাস্টিস' বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থি, কারণ কমিটির সভাপতি তাঁর সংসদীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রতিশোধ নিচ্ছেন এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়া অমূলক নয়। এছাড়াও *লেজলি স্টিফেন্সের* উদ্ধৃতি দিয়ে *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ* মামলার [১৫ বিএলটি (এইচসিডি) (২০০৭)] রায়ে বাংলাদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ও বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির বলেন যে, সংসদের ক্ষমতা সীমাহীন নয় – সংসদ যা-ইচ্ছা-তা করতে পারে না। অযৌক্তিক ও নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডেও সংসদ জড়িত হতে পারে না।

৬.০ উপসংহার

সংসদীয় কার্যক্রম যথাযথ ও পরিপূর্ণভাবে পরিচালনার জন্য সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বিধান অপরিহার্য। এগুলোর কিছু ব্যক্তি সংসদ সদস্যদের বেলায়, কিছু পুরো সংসদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজকীয় রোষ ও হুমকির মুখে বৃটিশ পার্লামেন্ট যাতে নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এগুলোর উৎপত্তি। এগুলোর মাধ্যমে সংসদ তার কার্যপদ্ধতিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সংসদের অথরিটি বা অধিকারিত্ব এবং ডিগনিটি বা মর্যাদা ক্ষুন্ন করলে সংসদ যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবমাননার দায়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। শুধুমাত্র সংসদ বা সংসদীয় কমিটির কার্যপরিচালনায় বাধা প্রদান করলেই সংসদ এ ক্ষমতা বাইরের কারো বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে। অসদাচারণের মাধ্যমে সংসদের মর্যাদাহানির অভিযোগে নিজ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের, এমনকি বহিষ্কারাদেশ প্রদানের ক্ষমতাও সংসদীয় বিশেষ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো কোনো দেশের সংবিধানে নিজ সহকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংসদকে সুস্পষ্টভাবে দেয়া আছে। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলেও নিজ সদস্যদেরকে শাস্তি প্রদানের, এমনকি বহিষ্কারের এখতিয়ার সংসদের অন্তর্নিহিত এবং অতি প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। অনেক দেশেই এ ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছে মূলত সেসব ব্যক্তির

ক্ষেত্রে যারা তাঁদের অপকর্মের মাধ্যমে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছেন এবং সংসদের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করেছেন। বিভিন্ন দেশের আদালতও সংসদের এ ক্ষমতার বৈধতা প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে সাক্ষী প্রমাণের পর্যাপ্ততা, এমনকি পদ্ধতির যথার্থতার প্রশ্নেও আদালত শিথিলতা প্রদান করেছে। তবে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, সংসদের শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত বিচারিক পর্যালোচনার এখতিয়ার আদালতের রয়েছে। তবে শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, অযৌক্তিকতা, অসাংবিধানিকতা, স্বাভাবিক ন্যায়বিচারহীনতা ও বিকৃত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এ পর্যালোচনা সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষে আদালত মত দিয়েছেন।

আমাদের সাবেক স্পীকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছে। তাঁর কিংবা যে কোনো সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অসদাচারণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংসদের কর্তব্য হবে সংসদীয় অধিকার ক্ষুন্ন করার অভিযোগে তাঁদের সংসদ থেকে বহিষ্কার করা। একইসাথে সাম্প্রতিককালে যে সকল সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের উশৃঙ্খল আচরণ ও আসদাচারণের অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। তা না হলে পুরো সংসদের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থাশীলতা নষ্ট হবে। তাই আমাদের মাননীয় স্পীকারকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

এছাড়াও সংসদীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ও দুদকের মধ্যেকার বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রেও আমরা মাননীয় স্পীকারের নেতৃত্ব আশা করি। আমরা আরো আশা করি যে, বিরোধটি সংবিধান, আইন, নৈতিকতা ও জনকল্যাণবোধের আলোকে তিনি নিরসন করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁর প্রচেষ্টায় দুর্নীতির প্রতি আপোসকামীতা প্রদর্শিত হবে না, কারণ তা দুদককে একটি সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংসদ সদস্যগণ অতি মর্যাদাবান ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত। তাঁদেরকেই সততা ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা এবং নিজ আচরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে। তাই সরল বিশ্বাসে ও জনস্বার্থে তাদের কৃত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান প্রযোজ্য, কিন্তু তাদের উশৃঙ্খল ও অপরাধী কর্মকাণ্ডের বেলায় নয়, যে কর্মকাণ্ড পুরো সংসদকেই হেয় প্রতিপন্ন করে। এসব আচরণ উপেক্ষা করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কয়েক শতাব্দী আগে রাজকীয় হুমকির মুখে বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তির ধারণার উৎপত্তি হলেও, দুর্ভাগ্যবশত কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অপকর্মের অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে – ভারতীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও-এর সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে উৎকোচের বিনিময়ে ভোট দিয়ে সংসদীয় দায়মুক্তির দোহাই দিয়ে পার পেয়ে যাওয়া যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সংসদ সদস্যরাও, যাঁদের দায়িত্ব সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে থাকতে পারেন না।

অসদাচারণের অভিযোগে সংসদীয় বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন করার দায়ে সংসদ সদস্যদেরকে বহিষ্কার, কারারুদ্ধ করা তথা তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তাঁদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ হাতিয়ারের সঠিক ব্যবহারের জন্য বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও দায়মুক্তির বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আমরা আশা করি যে, সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের বর্তমান সংসদ জরুরিভিত্তিতে এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করবে। এর ফলে যে সকল সংসদ সদস্য তাঁদের বিশৃঙ্খল, অনৈতিক ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পুরো সংসদের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে। ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করার লক্ষ্যে গঠিত একটি সাব-কমিটিও সংসদীয় বিশেষ অধিকার বিষয়ে একটি আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছে বলে আমরা সংবাদপত্রে পড়েছি। প্রসঙ্গত, পাঁচ বছর পর পর ভোটারদের সম্মুখিন হওয়ার মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের দায়বদ্ধতা যথাযথভাবে নিশ্চিত হয় না, কারণ এ প্রক্রিয়ায় অপরাধ করে দণ্ড এড়ানো যায়। তাই সংসদ সদস্যদের 'রিকল' বা প্রত্যাহার করার বিধানও আইনে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক, যা পৃথিবীর অনেক দেশেই রয়েছে।

আমাদের অতি সম্মানিত মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সকল কর্মকাণ্ড সকল ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নের উর্দ্ধে রাখার লক্ষ্যে তাঁদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করাও আজ জরুরি – ভারতীয় লোকসভার একটি বিশেষ কমিটি সম্প্রতি এমন একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করেছে। আচরণবিধিতে অবশ্যই তাঁদের 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' বা স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে এমন বিষয়গুলো ঘোষণা করার বিধান থাকতে হবে। আর এ আচরণবিধি কঠোরভাবে প্রয়োগের লক্ষ্যে একটি সংসদীয় 'এথিক্স কমিটি' গঠনও আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংবিধান প্রণয়নের পর কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বিলিতে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজে এথিক্সের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

*'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র উদ্যোগে ২৮ মে, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় উত্থাপিত ও পরবর্তীতে সামান্য সংশোধিত প্রবন্ধ।